নাম তার ছিল জন হেনরি

অলকানন্দা মালা

‘জন হেনরি, জন হেনরি/
নাম তার ছিল জন হেনরি/
ছিল যেন জীবন্ত ইঞ্জিন/
হাতুড়ির তালে তালে গান গেয়ে শিল্পী/
খুশি মনে কাজ করে রাত-দিন/
হো হো হো হো/
খুশি মনে কাজ করে রাত-দিন।’

১লা মে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। এদিন কারখানার চিমনির ধোয়া ও কালিঝুলি গায়ে মাখা শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে রুখে দাঁড়ানোর। এদিন শিকাগো শহরের হে মার্কেটের সামনে হাজারো শ্রমিকের উপস্থিতিতে বুকের তাজা রক্তের দামে নিপীড়িতদের ন্যায্য পাওনা আদায়ের। সেই থেকে প্রতি বছর মে মাসের ১ তারিখ পালিত হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে। ক্যালেন্ডারের পাতায় জ্বলজ্বল করতে থাকা এই দিনটিতে ত্যাগ স্বীকার করা শ্রমিকদের শ্রদ্ধা জানাতে যুগে যুগে রচিত হয়েছে অসংখ্য গান কবিতা গল্প। এদেশের সাহিত্যেও পড়েছে তার প্রভাব। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ‘নাম তার ছিল জন হেনরি’ শিরোনামের গানটি। শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইস্পাত দৃঢ় এক অকুতোভয় মানুষের অবয়ব, যিনি দৃঢ় সংকল্পে খুড়ে চলেছেন পাহাড়। যার প্রতাপের কাছে নতি স্বীকার করছে ইঞ্জিনচালিত দ্রুতগতির মেশিন।

গান গেয়ে পাহাড় কাটায় রত পেটানো শরীরের দীর্ঘকায় হেনরির সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন গণসংগীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস। তার কথা ও সুরেই এদেশের সংগীতাঙ্গনে প্রথম শোনা গিয়েছিল হেনরির গান। মে দিবসকে ঘিরে রচিত হয়েছিল গানটি। বাংলা ভাষায় মে দিবস নিয়ে যা কিছু কাজ হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম এই গানটি। জন হেনরিকে নিয়ে বাংলার ভাষার বাইরে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে। বিশ্বের কোণায় কোণায় তাকে নিয়ে গান বেঁধেছেন পল রবসন, হ্যারি বেলাফন্টে, পিংক অ্যান্ডারসন, লিওন বিব, লিড বেলি, জনি ক্যাশ, ব্রুস স্প্রিংস্টিন।

ইতিহাসের পাতায় নিপীড়িত মানুষের কাছে আরাধ্য হয়ে আছে চরিত্রটি। তবে বলা বাহুল্য জন হেনরির সাথে ১লা মে শিকাগো শহরের হে মার্কেটের সামনে হাজারো শ্রমিক জমায়েতের কোনো সম্পর্ক নেই। রয়েছে শুধু শোষিতের হয়ে সংগ্রামের সম্পর্ক। আদর্শগত এই মিল থেকেই ইতিহাসের নায়ক হেনরি হয়ে উঠেছেন মে দিবসেরও নায়ক।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণের পেটানো শরীরের ছয় ফুট উচ্চতার হেনরি যেন ছিলেন আজন্ম প্রতিবাদী। অন্যায় অবিচার দুচোখে সহ্য করতে পারতেন না। আর তা যদি হতো তার স্বজাতি তথা কালো মানুষের সঙ্গে তাহলে তো মাথায় রক্ত উঠে যেত তার। রীতিমতো অগ্নিশর্মা হয়ে প্রতিবাদ মুখর হতেন তিনি। এমন স্বজাতি প্রেমের জন্য অবশ্য কম খেসারত দিতে হয়নি তাকে। একবার তো সাজা হয়ে গিয়েছিল। সে সময় নিউ জার্সি শহরে চার্লস বার্ড নমে এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার ছিলেন। কালোরা ছিল তার দুচোখের বিষ। যখন তখন তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন। তার রোষানলেই পড়েছিলেন হেনরি। চার্লস অহেতুক চুরির অপবাদ দিয়ে হেনরিকে পাঠিয়েছিলেন কারাগারে। তাকে ভার্জিনিয়া স্টেট পেনিটেনশিয়ারিতে (কারাগার) পাঠিয়েছিলেন অফিসার চার্লস বার্ড। আর কয়েক ডলার চুরির অপরাধে বিচারক হাতুড়ি পিটিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল তার দশ বছরের সাজার কথা। হেনরি যখন দশ বছরের সাজা ভোগ করছেন তখন ভার্জিনিয়ায় নতুন বিপ্লব। রেল লাইন তৈরিতে ভার্জিনিয়ার পাহাড় কেটে চলছিল এ কর্মযজ্ঞ। এদিকে জেলের বাড়তি ইনকামের কথা ভেবে বন্দিদের লাগিয়ে দেওয়া

হয়েছিল সেই কাজে। সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা সারা দিন-রাত সুড়ঙ্গে পাথর কেটে তৈরি করছিলেন এই লাইন। এ কাজের বিনিময়ে বন্দি প্রতি জেলকে দেওয়া হতো ২৫ সেন্ট করে। আর জেলখানা থেকে হাতেগোনা কয়েক সেন্ট করে দিত বন্দিদের। ওই দলে ছিলেন প্রতিবাদী হেনরি।

পাহাড় কাটার কাজটি ছিল অমানুষিক পরিশ্রমের। প্রথমে পাহাড়ের গায়ে ড্রিল বসানো হতো। এরপর আধমণ ওজনের হাতুড়ি পিটিয়ে ওই ড্রিল দিয়ে করা হতো গর্ত। তবে শুধু গর্ত খুঁড়েই কাজ শেষ হতো না। গর্তের ভিতর নাইট্রোজোন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গর্ত বড় করা হতো। এরপর তাতে শ্রমিকদের নামিয়ে দিতেন শেতাঙ্গ ঠিকাদাররা। তারা সুড়ঙ্গ ধরে ধরে করতেন কাজ। তবে হাড়ভাঙা খাটুনির হলেও হেনরির কাজের ধরন ছিল আলাদা। গলা ছেড়ে গান গেয়ে ছন্দের তালে তালে পাহাড় খুঁড়ে চলতেন তিনি। হেনরির এই আচরণে অন্য শ্রমিকদের মধ্যে বেশ আনন্দঘন পরিবেশ কাজ করত। কিন্তু একদিন এলো এক দুঃসংবাদ। শেতাঙ্গ ঠিকাদাররা মানুষ দিয়ে পাহাড় কাটার বিকল্প ব্যবস্থা পেয়ে গেলেন। তারা নিয়ে এলেন পাহাড় কাটার ড্রিল মেশিন, যা মানুষের চেয়ে দ্বিগুণ কাজ করতে পারে। কিন্তু এতে সায় ছিল না হেনরির। কেননা জেলের সাজাপ্রাপ্ত বন্দি ছাড়াও পাহাড় কাটার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত হাজারো কালো নারী-পুরুষ।

ওই জায়গা থেকে মেশিনটি ছিল শ্রমিকদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শমন। ওই মেশিনে পাহাড় কাটার কাজ শুরু হলে হাজারো শ্রমিক কাজ হারিয়ে পথে বসবে। সন্তানের মুখে তুলে দিতে পারবে না খাবার। ফলে মানুষগুলো নীরব থাকলেও ভিতরে ভিতরে ঠিকই আঁতকে উঠেছিল। বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন হেনরি। তাই শেতাঙ্গ ঠিকাদারকে মেশিনের ব্যবহার বন্ধ করতে অনুরোধ জানায় সে।

কিন্তু লাভে অভ্যস্ত ঠিকাদার কী আর শ্রমিকের দুঃখ বোঝে! এক্ষেত্রেও তাই হলো। ওদিকে হেনরিও ফিরে যাওয়ার পাত্র না। নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর ভীষণ আস্থা ছিল তার। তাই বুক চিতিয়ে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন ইঞ্জিনচালিত মেশিনকে। শেতাঙ্গদের অটুট বিশ্বাস ছিল হেনরি হেরে যাবে। তাই অনেকটা ব্যঙ্গাত্মকভাবেই সুযোগ দেয় তাকে।

হেনরি জানতেন, এই প্রতিযোগিতার ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে অসংখ্য প্রান্তিক মানুষের জীবন। সে জয়ী হলে ভার্জিনিয়ার বুকে ইঞ্জিন বন্ধ হবে। হাতুড়ি গাইতি নিয়ে সচল হবে শ্রমিকের হাত। দুমুঠো খাবার ও বেঁচে থাকার রসদ জুটবে তাদের। আর সে হেরে গেলে মেশিনের রাজত্বে বেকার হয়ে পড়বে তার স্বজাতি। এ কথা ভাবতেই দৃঢ়চেতা যুবক আরও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ওঠে। যে করেই হোক এই লড়াইয়ে মেশিনকে পরাজিত সে করবেই। হেরে যাওয়া চলবে না তার।

একদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শুরু প্রতিযোগিতা। লুইস টানেলের বাঁ দিক থেকে পাহাড় কাটতে থাকে মেশিন আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে ডান দিকে পাহাড় খুঁড়ে গভীরে যেতে থাকেন হেনরি। বিরামহীনভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। বিদ্যুতের গতিতে চলছে তার হাতুড়ি। শোনা যাচ্ছে তার গানের সুর। বাইরে অপেক্ষা করছে অগণিত কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক। সুড়ঙ্গের দেয়ালে গালে হাত দিয়ে বসে আছে হেনরির স্ত্রী-কন্যা। তারা মুখিয়ে আছে তার জয়ের অপেক্ষায়। অবশেষে সুসময় আসে। সূর্যাস্তের আগে পাথর কেটে টানেলের ১৪ ফুট গভীরে প্রবেশ করেন জন হেনরি। আর স্টিম ড্রিল মেশিন প্রবেশ করেছে মাত্র ৮ ফুট। ফলাফল মানুষের কাছে হেরে যায় দ্রুতগতির ইঞ্জিন। খবর পেতেই জয়োল্লাসে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ে শ্রমিকের দল। হেনরিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত তারা। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। মেশিনকে পরাজিত করে ক্লান্তি ও অবসন্নতায় ভেঙে পড়েছিল তার শরীর। রক্ত ঘামে একাকার হেনরি প্রশান্তির জন্য ঢলে পড়েন চিরঘুমে। এভাবেই সেদিন খেটে খাওয়া শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সবচেয়ে বড় ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন কালো হেনরি।

হেনরির এই কীর্তিগাঁথা নিয়েই গানটি বেঁধেছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। পরে গানটি অনেকেই কণ্ঠে তুলেছেন। কিংবদন্তি গণসংগীত শিল্পী ফকির আলমগীর গানটি কণ্ঠে তোলার পাশাপাশি নতুন সুরও দিয়েছিলেন। কালো হেনরিকে নিয়ে শুধু সাহিত্যকর্মই হয়নি। হয়েছে গবেষণাও। তবে তাকে নিয়ে গবেষকদের রয়েছে মিশ্র মতামত। কোনো গবেষক মনে করেন বাস্তবিক অর্থে জন হেনরি বলে কেউ ছিল না। এটি মূলত একটি পৌরাণিক ঘরানার চরিত্র। সেসময় শেতাঙ্গদের দ্বারা দিনের পর দিন নির্যাতিত হচ্ছিল ক্রীতদাস কৃষ্ণাঙ্গরা। তাই মনে আশার সঞ্চার করতেই জন হেনরির কল্পকাহিনি চালু করা হয়েছিল। চরিত্রটির দৃঢ়তার গল্প শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করা হতো তাদের।

তবে ভার্জিনিয়ার College of William and Mary– এর ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষক স্কট রেনল্ড নেলসন বলেন অন্য কথা। জন হেনরিকে নিয়ে বিস্তর গবেষণা করে হেনরিকে নিয়ে লিখেছেন Steel Drivin' Man: John Henry, the untold story an American Legend নামে একটি গবেষণামূলক বই। এই বইটি লিখতে কয়েক দশক সময় নিতে হয়েছে তাকে। ঘুরতে হয়েছে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পথে পথে, খোঁজ নিয়েছেন হেনরি সম্পর্কে। শেষে এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হন যে জন হেনরি রক্তে মাংসের একজন মানুষ ছিলেন। তার পুরো নাম ছিল জন উইলিয়াম হেনরি। বর্ণবাদের শিকার নিপীড়িতদের পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল তার। তবে সত্য মিথ্যা যা-ই হোক হেনরি এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে। কালে কালে নিপীড়িতদের পক্ষে বিদ্রোহে রুখে দাঁড়ানো প্রতিটি মানুষের মাঝেই যেন খুঁজে পাওয়া যায় তার ছায়া।